চতুর্থ অধ্যায়

বাল্যবিবাহের দোষ: বিশ্লেষণী পাঠ

বিদ্যাসাগর যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে যুগে সামাজিক যে বিধি নিষেধ ছিল তা নিয়ে কিছু কিছু মানুষের মনে নানা প্রশ্ন উদয় হয়েছিল। সে সকল বিধি নিষেধের গন্ডি থেকে বাঙালী হিন্দু সমাজ যাতে মুক্তি পায়, তাদের যাতে নতুন পাথের সন্ধান দেওয়া যায় সে বিষয়ে অনেকেই আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন, আর বিদ্যাসাগরের মনেও সেই আগ্রহ জেগে উঠেছিল। বাঙালী হিন্দু সমাজকে কু-সংস্কার থেকে মুক্ত করতে গিয়ে চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় তিনি সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন।

ঊনবিংশ শতব্দীর সমাজসংস্কার ও সুষ্ঠূ সমাজ গঠনে বিদ্যাসাগর সমাজ বিপ্লবীর ভুমিকা গ্রহন করেছিলেন। বিদ্যাসাগর টুলো পন্ডিতের ঘরে জন্ম নিয়ে, সংস্কৃত কলেজের পুরাতন শিক্ষা রীতিতে বড় হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি বাঙালী সমাজের প্রথম সমাজ সংস্কারক বলেই এদেশে পরিচিতি লাভ করেন। উনিশ শতকে যে সকল সমাজ সংস্কার আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল সে সমস্ত আন্দোলন গুলিতে বিদ্যাসাগর কোনো না কোনো ভাবে জড়িত ছিলেন।

সমাজের একটি পুরাতন সামাজিক প্রথা ছিল বাল্যবিবাহ। আর এই প্রথা সেই শতকের সামাজিক জীবনকে পর্যুদস্ত করেছিল নানাভাবে। বাল্যবিবাহের বিষয়ে প্রগতিশীল সমাজের কেউ কেউ বিরোধিতা করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ও বাল্য বিবাহের পক্ষে ছিলেন না কিন্তু বাল্যবিবাহ সম্পর্কে তিনি কোনো লেখালেখি করেন নি বা কোনো আন্দোলনও করেন নি।

বিদ্যাসাগর প্রথম থেকেই নানা পত্র পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি নানা ভাবে পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখে কুসংস্কারমূলক রীতির বিরুদ্ধে প্রচার করতেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি।

১৮৫০ সালে ‘সর্বশুভকরী’ পত্রিকায় বিদ্যাসাগর ‘বাল্যবিবাহের দোষ’ নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, এবং এটিই ছিল তার সমাজ সংস্কারমূলক প্রথম রচনা। ঠনঠনের কতিপয় যুবক ‘সর্বশুভকরী’ নামক একটি সভা এবং সেই সভার মুখপাত্র

হিসেবে 'সর্বশুভকরী' পত্রিকা প্রতিমাসে প্রকাশ করার মনোবাসনা নিয়ে বিদ্যাসাগরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বিদ্যাসাগরের বন্ধু মদনমোহন তর্কালংকারের ঐ পত্রিকার সঙ্গে গভীর যোগাযোগ ছিল। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। প্রতিমাসে একটি করে প্রবন্ধ প্রকাশ করত এই পত্রিকা। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়ই বিদ্যাসাগরের 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতে যদিও লেখকের কোনো নাম থাকত না তবুও বুঝতে কষ্ট হত না যে এটি বিদ্যাসাগরেরই রচনা, এবং তার অনেক প্রমানও পাওয়া যায়।

'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধটি এ কারণেই এত উল্লেখযোগ্য যে, প্রথমত সমাজ সংস্কার মূলক রচনার ক্ষেত্রে এটিই প্রথম রচনা তাই এই প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক মর্যদা লাভ করে, দ্বিতীয়ত পরবর্তী সমাজ সংস্কারমূলক অন্য রচনার ক্ষেত্রে বার বার শাস্ত্রের দোহাই দিতে হয়েছিল, কিন্তু বাল্যকালের বিবাহ যে 'অতি নির্দয় ও নৃশংস কর্ম' তা প্রমান করার জন্য বিদ্যাসাগরকে কোনো শাস্ত্রের দ্বারস্থ হতে হয় নি। এই কাজটি করেছিলেন তিনি তাঁর সাধারণ বুদ্ধি ও একান্ত নিজের যুক্তির সাহায্যে। তিনি অতি সহজ ভাষায় এবং বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তি প্রয়োগ করে যে ভাবে বাল্যবিবাহের দোষ এবং বয়স্ক বিবাহ কে সমর্থন করেছিলেন তাতে আমরা তাঁর বিপ্লবী মনোভাবেরই পরিচয় পাই। স্বাস্থ্য, সমাজ, নৈতিক ও বংশানুগতি সকল কিছু বিচার করেই তিনি বলেছেন–

> "যে বাল্যবিবাহ দ্বারা আমাদিগের এতাদৃশী দুর্দশা ঘটিয়া থাকে, সমূলে তাহার উচ্ছেদ করা কি সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর নহে?"[১]

বাল্যবিবাহের ফলে যে বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং এর ফলে যে সমাজে কত নারী দুঃখের সাগরে ভাসছে, কত প্রকার পাপের সঞ্চার হতে পারে, কত নারী সতীত্ব হারিয়ে বিপথে যায় একথাও তিনি তার প্রবন্ধটির উপসংহারে উল্লেখ করেছেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর প্রবন্ধটির শুরুতেই উল্লেখ করেছেন যে শাস্ত্র বলে–

> "অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা দান করিলে পিতামাতার গৌরীদানজন্য পূণ্যোদয় হয়, নবম বর্ষীয়াকে দান করিলে পৃথ্বীদানের ফল লাভ হয়, দশম বর্ষীয়াকে পাত্রসাৎ করিলে পরত্র পবিত্র লোক প্রাপ্তি হয়।"[২]

বিদ্যাসাগর শাস্ত্র নির্ধারিত এই সকল নির্দেশ অবহেলার সঙ্গে উপেক্ষা করেছেন। স্মৃতিশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, ভবিষ্যৎ বিবেচনা না করে যারা বাল্যবিবাহ দিয়ে থাকেন তারা তার কু-ফল বিবেচনা করেন না। বাল্যবিবাহের যে কি পরিণাম তার চিন্তা না করে পিতামাতা বাল্যকালে পুত্রকন্যার বিয়ে দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই বিবাহের ফলে দাম্পত্য জীবনে প্রেমের যে সুখ সেই সুখ থেকে অনেকেই বঞ্চিত হয়ে থাকে। বিদ্যাসাগর বলেছেন–

> "মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল। সেই ঐক্য বয়স, অবস্থা, রূপ, গুণ, চরিত্র, বাহ্যভাব ও আন্তরিক ভাব ইত্যাদি নানা কারনের উপর নির্ভর করে। অস্মদেশীয় বাল্যদম্পতিরা পরস্পরের আশায় জানিতে পারিল না, অভিপ্রায়ে অবগাহন করিতে অবকাশ পাইল না, অবস্থার তত্বানুসন্ধান পাইল না, আলাপ পরিচয় দ্বারা ইতরেতর চরিত্র পরিচয়ের কথা দূর থাকুক একবার অন্যান্য নয়নসঙ্ঘটন ও হইল না, কেবল একজন উদাসীন বাচাল ঘটকের প্রবৃত্তিজনক বৃথা বচনে প্রত্যয় করিয়া পিতা মাতার যে রূপ অভিরুচি হয়, কন্যা পুত্রের সেই বিধিই বিধিনিয়োগবৎ সুখ দুঃখের অনুল্লঙ্ঘনীয় সীমা হইয়া রহিল। এই জন্যই অস্মদেশে দাম্পত্যনিবন্ধন অকপট প্রণয় দৃষ্ট হয় না। কেবল প্রণয়ী ভর্তাস্বরূপ এবং প্রণয়িনী গৃহপরিচারিকাস্বরূপ হইয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করে।''[৩]

বিবাহের আসল উদ্দেশ্য হল একে অপরের প্রতি প্রেম ভালবাসার উপলব্ধি। কিন্তু বাল্যকালে বিবাহ হলে অপরিণত বালক বালিকা সেই সুমধুর সম্পর্ক বিষয়ে কিছুই বোঝে না, তাই এর সুফল থেকে বঞ্চিত থাকে। বিবাহ নামক বন্ধন সম্পর্কে শাস্ত্র যে নির্দেশ দেয়, বিদ্যাসাগর সে গন্ডি পেরিয়ে এসে স্বামী স্ত্রীর প্রণয়ের প্রতিই গুরুত্ব দিয়েছেন।

সকল সুখের মূলে রয়েছে শরীর ও স্বাস্থ্য। বাল্যবিবাহের ফলে তারও নিষ্পত্তি ঘটে। একজন বালিকার শরীর ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিজের মনে যদি প্রসন্নতা না থাকে তবে বুঝে নিতে হয় যে এই মানসিক দুর্বলতার কারণ তার বাল্যবিবাহ।

বাল্যবিবাহ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক যুক্তিও প্রদর্শন করেছেন। বাল্যকালে বিবাহ হলে সেই বালিকার গর্ভে যে সন্তান আসবে সে সন্তান অনেক

সময় গর্ভাবস্থাতেই শেষ হয়ে যায়, আর যদিও বা সে পৃথিবীর আলো দেখতে পায় তবে তার জননী সারা জীবন নানা পীড়ায় আক্রান্ত হয় বা তার মৃত্যুও হতে পারে। সে সম্পর্কে বিদ্যাসাগর বলেছেন–

> "অনতীত শৈশব জায়াপতি সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয় তাহার গর্ভবাসেই প্রায় বিপত্তি ঘটে, যদি প্রাণ বিশিষ্ট হইয়া ভুমিষ্ট হয়, তাহাকে তার ধাত্রীর অঙ্কশয্যাশায়ী হইতে না হইয়া অনতি বিলম্বেই ভুত ধাত্রীর গর্ভশায়ী হইতে হয়।"[৪]

সুতরাং যে সন্তান উৎপত্তির কারণের দাম্পত্য জীবনে বিড়ম্বনা ঘটে থাকে তা যে বাল্যবিবাহেরই দোষ তা বিদ্যাসাগর নির্দ্ধিধায় প্রকাশ করেছেন। তা ছাড়া আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় সন্তানহানির কারণ যে সবসময় কন্যার ঘাড়েই চাপানো হয়, সেটার মূলেও কিন্তু বাল্যবিবাহ।

বাল্যবিবাহ সকল দিক দিয়েই ব্যাধিগ্রস্থ। তার কারণ বাল্যবিবাহের ফলে বালক বালিকা শৈশব শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। বিদ্যা শিক্ষার প্রতি কোনো ধ্যান থাকে না। যেহেতু বিদ্যাশিক্ষার অভাব থাকে তাই একটি বালক উপার্জনকারী হওয়ার পুর্বে সন্তানের পিতা হয়। ফলে তার আর্থিক দুর্গতির সীমা থাকে না। আবার একজন নিরক্ষর বালিকা মা হওয়ার ফলে সন্তানকেও সে প্রথমিক শিক্ষা দান থেকে বঞ্চিত করে। কেননা আমরা জানি শিশুরা প্রথমে বাড়িতে মায়ের পাঠশালাতেই শিক্ষা লাভ করে।

বিদ্যাসাগর বলেছেন–

> "বাল্যকালে বিবাহ করিয়া আমরা সর্বতভাবে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হই। কারন, প্রথমত বিবাহ ঘটিত আমোদ প্রমোদে ও কেলিকৌতুকে বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য কাল যে বাল্যকাল, তাহা বৃথা হইয়া যায়। অনন্তর উপার্জনক্ষমতার জন্ম না হইতেই সন্তানের জন্মদাতা হই। সুতরং তখন নিত্যপ্রয়োজনীয় অর্থের নিমিত্তে অত্যন্ত ব্যাকুল হইতে হয়। কারন গৃহস্থ ব্যক্তির হস্তে ক্ষনেক অর্থ না থাকিলে চতুর্দশ ভুবন শূণ্যময় প্রতীত হইতে থাকে।"[৫]

বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, স্ত্রীলোকের মধ্যে যদি শিক্ষার ছোঁয়া থাকে তা হলে সে তার সন্তানকে ঘরে বসেই শিক্ষা দিতে পারেন। একটি সন্তান যতটুকু তার মায়ের প্রতি আকৃষ্ট থাকে ততটুকু তার বাবার প্রতি থাকে না। আর সেই মা যদি একটু শিক্ষিতা হন তাহলে তিনি তার সন্তান কে শিক্ষার উপদেশ দিতে পারেন। আর একটি বালক বালিকা যদি শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী হতে পারে তাহলে বিবাহের প্রতি তার টান ধীরে ধীরে কমে যেতে পারে। তাই পিতামাতা যদি বিবাহের নিয়মকে লঙ্ঘন করে বাল্যবিবাহের বদলে বাল্যশিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেন, অতি অল্প বয়সে যদি কন্যাকে পাত্রস্থ না করেন, তবে কিছুটা হলেও তার দুর্দশা দূর করতে পারবেন। অতত্রব সুশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ যদি স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে মনস্থির করে বাল্যবিবাহকে উচ্ছেদ করতে একটু যত্নশীল হন তবেই হয়তো তাদের অভিষ্ট সিদ্ধি করতে পারবেন।

বাংলাদেশের পুরনো সামাজিক প্রথা বাল্যবিবাহ, যে বিবাহ বিশ শতকের সামাজিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। প্রগতিশীল সমাজ নেতারা অল্প হলেও এই বিবাহের বিরোধিতা করেছেন। বাল্যবিবাহের বিরোধিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা' র কথা প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, কারণ এই সভাতেই রামমোহন এবং অন্যান্যরা বাল্যবিবাহ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। রামমোহন বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন বলে তিনি তাঁর নাতনীর বিবাহ ও ১৫/১৬ বছরের আগে দেন নি। কিন্তু সে সময়ে কেউ বাল্যবিবাহের বিরোধিতায় কোনো আন্দোলন গড়ে তোলেন নি।

বিশ শতকের চতুর্থ দশক থেকেই বাল্যবিবাহের সম্বন্ধে নানা ধরনের মত বিনিময় হতে দেখা যায়। আর মতামতের উপর ভিত্তি করেই আন্দোলনের ঢেউ ওঠে। ঈশ্বরগুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় বাল্যবিবাহের বিষয়ে যদিও বেশ কিছু লেখা লেখি করেছিলেন তথাপি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে 'সর্বশুভঙ্কঁরী' পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধটিই ছিল সারা জাগানো প্রবন্ধ। এই রচনাটি বাল্যবিবাহের দোষের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে খুব সাহায্য করেছিল। পরবর্তী সময়ে বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কার ও সামাজিক বিষয় আশয় নিয়ে একটি প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করেন এবং তাতে অনেকেই স্বাক্ষর করেছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় বাল্যবিবাহ নিয়ে মত বিনিময় শুরু হয়েছিল বিদ্যাসাগরের সময় থেকেই।

১৮৫৬ সালে 'বিদ্যোৎসাহিনী' পত্রিকায় কালীপ্রসন্ন সিংহের একটি প্রবন্ধে বাল্যবিবাহ রোধ করার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন প্রবন্ধে বা মৌখিক আলোচনাতে বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করা হত সত্যি কিন্তু খুব কম সংখ্যক খ্যাতনামা প্রভাবশালী ব্যক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে এগিয়ে এসেছিলেন ব্রাহ্মসমাজের নেতারাই।

'ভারত সংস্কারক' পত্রিকাতে সে যুগের অনেকেই জনমত সংগঠনে এগিয়ে এসেছিলেন। ১৮৭৩ সালের ১৮ই জুলাই 'ভারত সংস্কারক' পত্রিকায় 'বাল্যবিবাহ' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছিল–

> "হিন্দু সমাজে যত প্রকার পাপ প্রথা আছে, বাল্যবিবাহ তন্মধ্যে প্রধান। কি শরীর কি মন সমুদের দুরবস্থার প্রবল কারন এক বাল্যবিবাহ।"[৬]

ঢাকা শহরের কতিপয় যুবক মিলে 'বাল্যবিবাহ নিবারনী' নামে একটি সভা স্থাপন করেছিল। এই সভায় নিয়ম করা হয়েছিল যে কোনো ভদ্র মানুষ একজন বালিকার ১৪ বৎসর পূর্ণ না হলে তাকে বিবাহ করবে না। আর পুরুষের বিবাহের সময় হবে ২১ বৎসর। উক্ত সভা 'মহা পাপ বাল্যবিবাহ' নামে একটি পত্রও প্রচার করেছিল।

'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালিয়েছিল। দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকার মাধ্যমে বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহন করেছিলেন, যিনি ছিলেন একজন প্রকৃত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক ও 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক।

কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭০ সালে ভারত সংস্কার সভা গঠন করে ঐ সভার পক্ষ থেকে বিবাহের বিজ্ঞান সম্মত বয়স বেধে দিয়ে তিনি সেই বয়স অনুযায়ী বিবাহ প্রথা চালু করার চেষ্টা করেন।

১৮৭২ সালে তিন আইনের নির্দেশ অনুযায়ী বিবাহের বয়স ১৪ বলে নির্ধারণ করা হয় কিন্তু সোমপ্রকাশ ও কেশবচন্দ্র এই তিন আইনের বিরোধিতা করেন। সম্পাদক দ্বারকানাথ বাল্যবিবাহকে মেনে নিতে না পারলেও খুব বেশী বয়সের বিবাহকে মেনে নিতে পারেন নি।

বাল্যবিবাহ নিবারণের বিষয়ে মালাবারি কিছু কিছু উপায় নির্ধারণ করেছিলেন। সে সময় মালাবারির আন্দোলন ভারতে বিশেষ ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু অনেকেই তাঁর প্রস্তাবকে মেনে নিতে পারেন নি। যদিও মালাবারির কর্ম পদ্ধতিতে ত্রুটি ছিল তবুও তার বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলন একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলনের ব্যাপারে রক্ষনশীল সমাজ নীরব ছিল না। রক্ষনশীল সমাজের অনেকেই পুস্তক বা প্রবন্ধ রচনা করে বাল্যবিবাহের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। এই সমাজের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন অক্ষয়কুমার সরকার। 'নবজীবন' নামক একটি পত্রিকায় তিনি বাল্যবিবাহ সমর্থন পূর্বক তিনি বলেন 'বাল্যবিবাহ প্রশস্ত'।

বাল্যবিবাহ সম্পর্কে আরো একদল ছিলেন মধ্যমপন্থী। তারা বালিকার বা পূর্ণ যুবতীর বিবাহ কোনো বিষয়েই পক্ষপাতিত্ত করেন নি। তাঁরা শুধু বিবাহের বয়স নির্ধারন করে বলেন–

"স্ত্রী গনের দশ ও পুরুষের ষোড়শ বর্ষাবধি বিবাহই যুক্তি যুক্ত।"৭

বাল্যবিবাহ নিয়ে নানা মহলে নানা মতামত বিনিময় চলেছিল। আর মতামতের লড়াই চলছিল মৌখিক ও লৈখিক ভাবে।

বাল্যবিবাহবাদীরা বলতেন বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকলে বালক বালিকার ব্যভিচারগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। বিদ্যাসাগর তার জবাবে বলেছিলেন যে একটি বালক ও বালিকা বিদ্যাশিক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে বাল্যকালে বিবাহ না হলেও ব্যভিচারগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

বাল্যবিবাহের ফলে যে বিধবার সংখ্যা বাড়ছে সে কথাও বিদ্যাসাগরই বলেছেন। বাল্যবিবাহের বিপক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে বিদ্যাসাগর যেমন তাঁর মনস্তাত্বিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তেমনি সামাজিক অভিজ্ঞতারও পরিচয় দিয়েছেন। ১২৬২ সালে 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা' পত্রিকায় বাল্যবিবাহের দোষ নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তাতেও বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের সঙ্গে অনেক মিল লক্ষ করা যায়। দক্ষিণাত্যে বৈদিকদের মধ্যে বাল্যবিবাহের ফলে যে দুরবস্থা ঘটত তা যে ভাবনার অতীত একথাও প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি একথাও বলেছেন যে বাল্যবিবাহের ফলে সুস্থ শিশু জন্ম

নিতে পারে না। বাল্যবিবাহের পক্ষে সাধারণ ভাবে কতগুলি যুক্তি প্রচলিত ছিল, কিন্তু যারা বিপক্ষে এই প্রথা নিয়ে মসীযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন তারা প্রায় সকলেই একই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তাদের সেই সাধারণ যুক্তিগুলোকে যুক্তিহীন প্রমান করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন।

১২৮০ সালে 'ভারত সংস্কার' পত্রিকায় 'বাল্যবিবাহ' নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তাও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে। এই প্রবন্ধটিতে প্রবন্ধটির লেখক বাল্যবিবাহের দোষগুলি চিহ্নিত করে বলেছিলেন–

> "অল্প বয়সে বিবাহের জন্য সন্তান ধারণে নারীর ক্লেশ ঘটে; গর্ভবতী নারীর মৃত্যুও ঘটে সময় সময়। শিশু মৃত্যুও ঘটে থাকে। সুস্থ শিশু ভূমিষ্ট হয় না,-ভূমিষ্ট হলেও তার আয়ু কম হয়। প্রসূতির দুর্ভোগের শেষ থাকে না। বাল্যবিবাহের ফলে অনভিজ্ঞ বালিকা অক্ষম হলেও সাংসারিক দায় দায়িত্বের বোঝা বহন করতে বাধ্য হয়। তার ফলও ভালো হয় না।"[৮]

প্রাবন্ধিকের এই কথাগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা বিদ্যাসাগরের কথার সম্পূর্ন মিল পাই। সংসার রক্ষনাবেক্ষনের জন্য সাধারন যে জ্ঞানটুকু থাকা প্রয়োজন, অতি অল্প বয়সে বিয়ে হলে সেই জ্ঞানের অভাব থাকবেই। সন্তান ধারণের ক্ষেত্রেও তার সাধারণ জ্ঞানের অভাবে বিপত্তি ঘটবেই। শিশু প্রতিপালন ক্ষমতার অভাব থাকার কারণে শিশুটি মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

বাল্যবিবাহের শাস্ত্রগত আলোচনা করে প্রাবন্ধিক বলেছিলেন–

> "অজ্ঞাতপতি মর্য্যাদা মজ্ঞাত পতি সেবনম নোদ্বাহয়েৎ পিতাবালা মজ্ঞাত ধর্ম্মশাসনম্।"[৯]

অর্থাত যে কন্যা স্বামীর মর্য্যাদা সম্বন্ধে অজ্ঞাত, স্বামীর প্রতি কর্তব্য কর্মে যার কোন ধর্মশিক্ষা হয় নাই, তাকে বিবাহ দেওয়া একজন পিতার উচিত নয়।

ধর্মশাস্ত্রকার মনু বলেছিলেন- 'কুমারীর যৌবন শুরু হওয়ার পর তিন বৎসর কাল অপেক্ষা করতে হবে বিবাহের জন্য'। কিন্তু সবক্ষেত্রে সে সমাজে কি মনুর বিধানও মেনে চলত; এমন অনেক ঘটনাই তখন ঘটতে দেখা যায় যেখানে জন্মের পরই বাগদত্তা হয়ে যেত কন্যা এবং শ্বশুর বাড়ীতেই তার যৌবন প্রাপ্তি ঘটত। ফলে সুবিধাবাদী সমাজের কাছে কন্যা কোনো দিনই পণ্য ছাড়া মানুষের মূল্য পায় নি।

তবে বিদ্যাসাগরের প্রভাব সে সমাজে কিছুটা হলেও কাজ করেছিল। শ্যামাসুন্দরীর মতো একজন নারীর কলমেও নারীর নিজস্ব সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হতে দেখা যায়, তখন এতে সমাজ পরিবর্তনের দিশাই জাগ্রত হয়। শ্যামাসুন্দরী দেবী 'বাল্যবিবাহ ও অবরোধ প্রথা' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। ১২৮৯ সালে সাবিত্রী লাইব্রেরী থেকে পুরস্কার ও দান করা হয়েছিল। শ্যামাসুন্দরী বাল্যবিবাহকে নিতান্ত অসভ্য দেশের কাজ বলে মনে করতেন। তিনি জনান যে বাল্যবিবাহ কোনো বিবেকধারী লোকের কাজ নয়, এবং প্রাচীন ভারতে এই প্রথা প্রচলিত ছিল না। তাঁর মতে বালক বালিকার এমন বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত যে স্বামী বা স্ত্রীর প্রয়োজন হলে একে অপরকে সামাজিক অসৎ আচরন থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে। কিন্তু বাল্যকালে বিবাহ হলে তা সম্ভব হয় না। কারো কারো মতে বাল্যবিবাহের ফলে বালক বালিকার মনে কোনো কলঙ্ক থাকে না। এই বক্তব্যের জবাবে শ্যামাসুন্দরী বলেছেন শিক্ষা দীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে অল্প বয়সে চরিত্র খারাপ হতে পারে না। বালিকাও যদি একটু বেশী বয়সে পর্যন্ত পিতার ঘরে থেকে ভালো শিক্ষা লাভ করে তবে বিবাহের পরও তার চরিত্র কখনও খারাপ হয় না।

রামচন্দ্র দত্ত বাল্যবিবাহের বিষয়ে একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন নাম 'বাল্যবিবাহ'। ১২৯৪ সালে বইটি প্রকাশিত হয়। রামচন্দ্র বাল্যবিবাহের বিরোধীই ছিলেন। তিনি বলেছিলেন মানুষের জীবনে সংসার যাত্রা নির্বাহ করার জন্য যে বিবাহ নামক কর্ম সংগঠিত করা হয় তার পূর্বে পাত্র পাত্রী দুজনকেই যাচাই করে নেওয়া উচিত যে তারা সংসারী হওয়ার উপযুক্ত কি না শারিরীক ও মানসিক ভাবে। মনুর বচনের উপর ভিত্তি করে তিনি বলেছেন, একজন ব্যক্তি যদি নিজে নিজেকে ভাল করে বুঝতে না পারে, জানতে না পারে, চিনতে না পারে তাহলে তার পায়ে বিবাহ নামক শেকল পরিয়ে দেওয়া উচিত নয়। বাল্যবিবাহের ফলে পুরুষ, নারী ও শিশুর যে ক্ষতি হয় তাও তিনি আলোচনা করেছেন।

১২৯৪ সালে নবজীবন পত্রিকায় 'বাল্যবিবাহ' নামে একটি রচনা প্রকাশিত হয়। এই রচনাটিতে রচনাকার অতি কুশলতার সহিত বাল্যবিবাহকে সমর্থন করেছেন। কথোপকথন ধরনের লেখা রচনাটিতে তিন জন অংশ নিয়েছিলেন। অংশ গ্রহনকারী তিনজনের মধ্যে একজন অধ্যাপক রামচন্দ্র, ছাত্র বিজয় ও বসন্ত। বিজয়ের মতে বাল্যবিবাহের ফলে পুরুষ হীনবীর্য হয়ে পড়ে, লেখাপড়া করার সুযোগ পায়না, মন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, মস্তিস্ক তেজহীন হয়, শরীর দুর্বল হয়। বসন্তের মতে বর্তমান শিক্ষারীতিই সকল অনিষ্টের মূল। শিক্ষার তাগিদে পুরুষেরা ভালো করে সময় মত আহার বিহার করতে পারে না। স্কুলের কথা ভাবে, পরীক্ষার চিন্তায় অপর্যাপ্ত পরিশ্রম করে তাই পুরুষের তেজ কমে যায়। বসন্তের মতে বর্তমান শিক্ষারীতিই তেজহীনতার কারণ, বাল্যবিবাহের কারণে নয়। বিবাহ বেশী বয়সে করা একেবারেই উচিত নয়।

রক্ষনশীল সমাজ যে কতখানি দুর্বল যুক্তি দিয়ে বাল্যবিবাহকে সমর্থন করেছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় এই রচনাটিতে। বিজয়ের মতে বাল্যবিবাহের কারণে অল্প বয়সে সংসারের দায়িত্ব উঠাতে হয় বলে বালকেরা পড়া শুনা ছেড়ে দিয়ে রোজগারের চেষ্টায়, চাকরীর চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই তাদের শিক্ষা সম্পূর্ন হয় না। বসন্তের মতে, সভ্রান্ত পরিবার থেকে বিবাহ করলে কন্যার পিতা আরও ভালভাবে নিজের জামাইকে লেখাপড়া শেখাবেন।

বিজয় ও বসন্তের কথাবার্তার মধ্যে অধ্যাপক রামচন্দ্র যে ভাষণ দিয়েছিলেন সে ভাষণ সম্পূর্নরূপে বাল্যবিবাহের সমর্থনে। তাদের এই কাথোপকথোনের মাধ্যমে একটা কথা বোঝানোর চেষ্টা হয়েছিল যে প্রাচীন কালে বেশীবয়সে বিবাহ হলে কোনো দোষের ছিলনা, এখন হঠাৎ করে বেশী বয়সে বিবাহ হওয়াটা দোষের।

নবজীবন পত্রিকাটি ছিল রক্ষনশীল হিন্দু জনগোষ্টীর পত্রিকা। তাই এই পত্রিকাটিতে যে রক্ষণশীল সমাজের কথা থাকবে এটাতো স্বাভাবিক।

নবজীবন পত্রিকায় অক্ষয়কুমার সরকারের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যার নাম 'হিন্দুবিবাহ'। অক্ষয়কুমার রক্ষনশীল সামাজের মানুষ। যেহেতু তিনি রক্ষনশীল মনোভাবাপন্ন সেহেতু বাল্যবিবাহকে সমর্থন করাটা স্বাভাবিক। তিনি বলেছিলেন–

> "পত্নীকে আপন মহৎ উদ্দেশের অনুগামিনী করিতে হইলে তাহার সমস্ত শিক্ষা আপনার হাতে রাখা আবশ্যক একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নিজে শিক্ষিতা নয় এমন বেশী বয়স্কা স্ত্রীলোকের মধ্যে সর্ব্বরকমেও সকল অবস্থায় ও চিরকালের মতন নিজের আনুগামিনী হইতে পারে, এমন স্ত্রী যে একেবারেই পাওয়া যাইতে পারে না, এমন কথা বলি না। কিন্তু পাইবার সম্ভাবনা বড় কম।"[১০]

সে যুগের প্রায় সকলেই ছিলেন বাল্যবিবাহের বিপক্ষে। বাল্যবিবাহের ফলে যে শিশু মৃত্যু ঘটে এমন কি মাতারও মৃত্যু ঘটে, এই কথার উত্তরে অক্ষয়কুমারের মত হল প্রসূতির পরিচর্যার অভাব ও খাদ্যবস্তুর অভাব ও অযত্ন থেকেই এই বিপত্তি ঘটে। তাঁর এই কথা থেকে আমাদের বোঝতে কষ্ট হয় না যে অক্ষয়কুমারের এই মত নিতান্ত ধামাচাপা ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি রক্ষণশীল মনোভাবকেই এখানে প্রতিষ্টিত করতে চেয়েছিলেন।

বাল্যবিবাহ নিয়ে যতই মতের বিনিময় ঘটে থাকুক না কেন, বাল্যবিবাহ আন্দোলন একমাত্র অগ্রণী পুরুষ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। যেসকল ব্যাপার নিয়ে কখনও কখনও কারও দৃষ্টি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠত, কারও কারও ভ্রু কুঞ্চিত হত, বিদ্যাসাগর সমাজের সে সকল কু-সংস্কার দূর করার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বাল্যবিবাহের দোষ-এ সমস্ত যুক্তিবাদ কান্ডজ্ঞান দেশাচারকে উপেক্ষা করেছেন বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন বাল্যবিবাহ বন্ধ করে বালক বালিকাদের শিক্ষার আলো দেখাতে। আর বালিকারা যদি শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত হয় নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে একটু সজাগ হবে। একটু একটু করে যদি শিক্ষার ছোয়া নারীর মনে লাগে হয়তো একদিন নারীরা নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবে। একটু একটু করে যদি নারীরা অগ্রসর হয় তা হলে ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে। আর এই আশা মনে পোষন করেই বিদ্যাসাগর সমাজের কু-সংস্কার বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন।

তথ্যসূত্র-

1. বিদ্যাসাগর রচনাবলী, সুবোধ চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৫৫৯ ।
2. ঐ পৃষ্ঠা ২৪৫।
3. ঐ পৃষ্ঠা ৫৫৬-৫৫৭।
4. ঐ পৃষ্ঠা ৫৫৭।
5. ঐ পৃষ্ঠা ৫৫৮।
6. ১৯ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা, অজয়েন্দ্রনাথ সরকার, পৃষ্ঠা ৯১।
7. ঐ পৃষ্ঠা ৯৫।
8. ঐ পৃষ্ঠা ২৩৯।
9. ঐ পৃষ্ঠা ২৩৯।
10. ঐ পৃষ্ঠা ২৪৪।

****